তারিখ 25 FEB 2014 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যতকথা

ড. মো. ইকবাল হোছাইন

যোগ্য ও আদর্শ নাগরিক সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অবদান অপরিসীম। বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ তৎকালীন সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সাধারণ জনতা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুক্তির যাত্রায় শামিল হয়েছে। অনেক সম্মানিত শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী ঘাতকের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। তবুও স্বাধীনতার চেতনা থেকে বিচ্যুত হননি। স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এককভাবেই এদেশের উচ্চ শিক্ষার কান্ডারী হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। স্বাধীনতা-পরবর্তীতে স্বৈরাচারী এরশাদের শত সহস্র অত্যাচারেও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ মাথানত করেনি। এক কথায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র সুদৃঢ় করার প্রতিটি পদক্ষেপে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভূমিকা অপরিসীম। নব্বইয়ের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সফলতার পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হওয়ার পর থেকেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নে পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা শুরু হয়। বলা হচ্ছে কিছু শিক্ষক কেবল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, বিভিন্ন এনজিও বা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীর পরামর্শক হিসেবে কাজ করেন, আবার কেউ কেউ নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত হন না। অভিযোগগুলো ঢালাওভাবে সত্য না হলেও একেবারে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। কথাটি ইউজিসির সদ্য প্রকাশিত ২০১২-র রিপোর্টে উঠে এসেছে এভাবে, উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষকের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ রয়েছে। অনেক শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস না নিয়ে কিংবা শিক্ষার্থীগণকে পূর্বাহ্নে কোন নোটিস না দিয়ে ক্লাসে ক্লাসে অনুপস্থিত থাকেন। এমনকি ব্যবহারিক ক্লাসেও যথেষ্ট সময় উপস্থিত থাকেন না। অবশ্য অধিকাংশে শিক্ষক যে উল্লিখিত অনৈতিক কাজের সাথে জড়িত নয় এ বিষয়টিও রিপোর্টে উঠে এসেছে। রিপোর্টে আরও উঠে এসেছে 'অনেক শিক্ষকের অফিস কক্ষ দুপুরের পর তালাবদ্ধ থাকে।... একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন এবং নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধিকতর সময় ব্যয় করেন। আর ছুটিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন, ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের পর্যাপ্ত সময় না দেয়ার অভিযোগতো আছেই। অভিযোগের সত্যতা কিছুটা হলেও আছে তা আমি আগেও উল্লেখ করেছি। এসব অভিযোগ পর্যালোচনা বা আমলে নেয়ার পূর্বে মনে রাখতে হবে নির্দিষ্ট কয়েকটি শিক্ষা বিষয়েই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত কতিপয় শিক্ষক সংশ্লিষ্ট থাকেন। অন্যদিকে অধিকাংশ শিক্ষকবৃন্দ অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে নিজ বিভাগের অর্পিত দায়িত্ব তথা ক্লাস, ব্যবহারিক পরীক্ষা, পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নসহ সকল দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক তাঁদের জীবন নির্বাহে অনেকাংশেই সম্পূর্ণভাবে মাসিক বেতনের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং অল্প কিছু শিক্ষকের অতিরিক্ত আয়ের দিক বিবেচনায় এনে সকল শিক্ষককে ঢালাওভাবে অভিযুক্ত করা উচিত হবে না।

বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে একমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা এখনো সর্বসাধারণের সন্তান-সন্ততিদের জন্য উন্মুক্ত। স্বাধীনতার দলিলে যে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে তার অনেকটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পূরণ করে থাকে। আর্থিক সংকট কারণে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নাজুক অবস্থার কথা যথাযথভাবে রিপোর্টে ফুটে উঠেনি। সত্যিকার অর্থে অর্থ বরাদ্দের অপ্রতুলতার কারণে বেতন ভাতার চাহিদা পুরণেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হিমশিম খাচ্ছে। গবেষণা খাত সেখানে একেবারেই উপেক্ষিত। ২০১২ সালের ইউজিসি রিপোর্ট অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭৯২৬.১৬ (লক্ষ) টাকা যেখানে বেতন ভাতা খাতে খরচ সেখানে কেবল মাত্র ১.৩৫ (লক্ষ) টাকা গবেষণা খাতে ব্যয় হয়েছে। রাজশাহীতে ২.৩৭ চট্টগ্রামে ৯.০০ (লক্ষ) টাকা ব্যয় হয়েছে। দু'একটি বাদে অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা খাতে ব্যয়ের করুণ অবস্থা একই রকম। আর গবেষণা বৃত্তির ফল ৩৪ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ২৩টিতে শূন্য। অর্থাৎ গবেষণা বৃত্তি খাতে ১১টিতে কিছু অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে আর বাকি ২৩টিতে একটি টাকাও এ খাতে খরচ করা হয়নি। এই যদি দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা খাতের অবস্থা হয় তা হলে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের প্রয়োজনীয় গবেষণায় আমরা কত পিছিয়ে তা সহজেই অনুমেয়। গবেষণায় অর্থের বরাদ্দ না বাড়িয়ে কেবল ভাল ফলের আশা করা ধান রোপণ করে সার-সেচ ব্যতীত ভাল ফলনের কল্পনা বিলাসেরই নামান্তর। ছাত্র বৃত্তির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আজ থেকে বিশ বছর আগেও মেধাবী ছাত্রদেরকে যে পরিমাণ অর্থ বৃত্তির বিপরীতে বরাদ্দ দেয়া হত এখন তাই আছে। আর শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির কথাতো বারবার আলোচনায় আসছে। আমাদের শিক্ষামন্ত্রী অনেকবারই শিক্ষকদের আলাদা বেতন কাঠামো করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এর বাস্তবায়নসহ সার্ক দেশসমূহের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন কাঠামো না করলে শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মানের দাবি কেবল শ্লোগানেই থেকে যাবে। মাসিক বেতন যে শিক্ষকের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল সে স্বাধীনভাবে শিক্ষা কার্যক্রম ও গবেষণায় অংশ নিবে কিভাবে?

বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসে ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দের দলীয় লেজুরবৃত্তির রাজনীতি শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ গঠনের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক বলে অনেকেই মনে করেন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে যেভাবে অস্ত্রের অবৈধ ব্যবহার বাড়ছে আর পেশীশক্তির প্রভাবে যেভাবে হল দখল করা হচ্ছে তাতে ক্যাম্পাসকে অনেকেই অনিরাপদ বলে অভিহিত করেছেন। সত্যিকার অর্থে বলতে কি দলবাজি আর টেন্ডারবাজির কারণে শিক্ষার পরিবেশসহ সার্বজনীন সহাবস্থান অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। আর শিক্ষক নিয়োগে দলীয় পরিচয়ের কাছে মেধাবীরা অসহায় হয়ে আছে। কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগেও একই দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে। ফলত: মেধা শূন্য হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখানে প্রয়োজন অতিরিক্ত অফিসার ও কর্মচারী আছে কিন্তু ইংরেজীতে/বাংলায় অফিস আদেশ বের করতে হলে নিজেকেই ড্রাফট লিখে দিতে হয়। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার কোন আলামত আপাতত: দেখা যাচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে সুশাসন ও শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র বানাতে হলে উল্লিখিত বিষয়টির উপর বেশ করে নজর দিতে হবে। শিক্ষামন্ত্রীকে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে। আর এ বিষয়ে ইউজিসিকে সত্যিকার পদক্ষেপ নিতে হবে।

দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতায় আমি মনে করি অবকাঠামোর ও যোগ্য শিক্ষকের দিক থেকে আমাদের কমতি আছে ঠিকই তবে একেবারে পিছিয়ে নেই। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে সরকার ও ইউজিসি যদি আরেকটু দৃষ্টি দেন, গবেষণাকে উৎসাহিত করার জন্য পর্যাপ্ত অর্থের ব্যবস্থা করেন, বেতনকাঠামো পরিবর্তন করে মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষকদের ধরে রাখার ব্যবস্থা করেন তাহলে ডিজিটালাইজেশনের এ যুগে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আরো বেশী করে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে থেকে জাতি গঠনে অবদান রাখতে পারবে।

● লেখক : অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

দৈনিক ইত্তেফাক